শেখ হাসিনার প্রতিক্রিয়াশীল রক্তরঞ্জিত শাসন নিপাত যাক! প্রকৃত বিপ্লবের মাধ্যমে মৌলিকভাবে নতুন একটি মুক্তিদায়ক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে!

জনগণের বীরত্ব আজ শাসকগোষ্ঠীর বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। জনগণ এক প্রেরণাদায়ী সংগ্রামের সূচনা ঘটিয়েছে যাকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে চলমান ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য আন্দোলনে ছাত্রলীগ এবং পুলিশ আক্রমণ করে এ পর্যন্ত দুই শতাধিকের বেশি মানুষকে খুন ও অসংখ্য মানুষকে হতাহত এবং গ্রেফতার করেছে। সেই থেকে পুলিশ এবং ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম ক্রমাগত বাড়ছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন এখন এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা সমগ্র দেশের মানুষের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং বদলে গেছে এই আন্দোলনের চরিত্র। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কার আন্দোলন এখন প্রধানভাবে রাষ্ট্র-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। স্লোগান উঠেছে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতনের। দীর্ঘ ষোল বছরের প্রতিক্রিয়াশীল ও অবৈধ ক্ষমতার অবসানের দাবিতে জনগণ রাজপথে শহীদ হচ্ছেন। বর্তমানে এই আন্দোলনের প্রধান দিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর হত্যাকান্ডের বিরোধিতা এবং শেখ হাসিনার পতন। ইতোমধ্যে হাসিনা সরকার গদি হারানোর বিপদ দেখে সংলাপে বসার প্রস্তাবনা দিয়েছে যা জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোটা আন্দোলনের নেতৃত্ব সংলাপে রাজি হয় এবং আন্দোলনের ঐক্যে ফাটল ধরায় তবে সেসব সুবিধাবাদী বিশ্বাসঘাতক নেতারা আন্দোলনকারীদের চরম ক্রোধের সম্মুখীন হবে। ফলে সরকার আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব, বিজিবিসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীকে রাস্তায় নামিয়েছে। ঢাকার রাস্তায় আর্মড কার আর আকাশে হেলিকপ্টার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এরা নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করছে। সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে আন্দোলনকারীদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আন্দোলনের উত্তরোত্তর ব্যাপ্তিলাভের কারণে কারফিউ জারি করে সারাদেশে সেনাবাহিনী নামিয়ে জনগণকে দমন করার চেষ্টায় রত সরকার।

স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সরলরৈখিকভাবে অনন্তকাল যাবৎ চলতে পারে না

জনগণের বিপুল আত্মত্যাগ সত্ত্বেও যেকোন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সরলরৈখিকভাবে অনন্তকাল যাবৎ চলতে পারে না। আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকৃত বিজয় আনার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পথ। আর এর জন্য প্রয়োজন সমস্যার কার্য-কারণ পুরোপুরি অনুধাবন করে কাঠামোগতভাবে নতুন রাষ্ট্রীয় রূপ ভাবতে পারা। এটি সম্ভব করতে পারে কেবল বিজ্ঞান-সম্মত বিপ্লবী তত্ত্বে সজ্জিত একটি বিপ্লবী পার্টি। যদি এই বিপ্লবী শক্তি আন্দোলনের সাথে ঐক্য করে আন্দোলনের গতিমুখ বিপ্লবের দিকে পরিবর্তিত করতে না পারে তাহলে যেকোন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন এক পর্যায়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ, প্রবল প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ সর্বোচ্চ শাসক শ্রেণির ক্ষমতা হাতবদলের পুঁজিতে পরিণত হবে।

যদি এই আন্দোলন ক্রমশ আরও তীব্র হয় এবং বিস্তৃতি লাভ করে, এবং যদি সঠিকভাবে এ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তা বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় এবং বিপ্লবী চিন্তার বীজ বপনের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখবে। আমাদের বুঝতে হবে যে জনগণ যে বাস্তবতার সম্মুখীন সে বাস্তবতা সম্পর্কে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম না। কারণ একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের বিভাজন বিরাজ করে। ফলে সমাজের নিপীড়িত জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করার সুযোগ থাকেনা। তাছাড়াও গণমাধ্যম ও সম্মতি উৎপাদনের অন্যান্য উপায়গুলোর উপর শাসকশ্রেণির নিয়ন্ত্রণ জনগণের চিন্তাজগতে শাসকশ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ফলে জনগণের ভেতরে বিদ্যমান সম্ভাবনাকে বিপ্লবের স্বার্থে কাজে লাগাতে হলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার সাথে সংগ্রাম করে একে বিপ্লবী চিন্তায় রূপান্তরিত করতে হবে।

আমাদের দরকার একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব!

কারণ আমাদের দরকার একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব। বিদ্যমান নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র, শাসকশ্রেণি এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী মাতব্বরদের সশস্ত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদ না করে কোনভাবেই শোষণ, নিপীড়ন ও অসমতা দূর করা সম্ভব না। শোষণ-নিপীড়নের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সম্পর্ককে সমাজের গভীর থেকে সমূলে উচ্ছেদ না করলে পুনরায় সমাজ আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের কাজ শুধুমাত্র

সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠীর সাথে ব্যাপক জনগণের বৈরি সম্পর্কের রূপান্তর নয়, বরং জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা করা। জনগণের মাঝে বিদ্যমান মানসিক শ্রমের সাথে শারীরিক শ্রমের দ্বন্দ্ব, নারী ও পুরুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, গ্রাম ও শহরের পার্থক্য ইত্যাদি নানাবিধ অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের রূপান্তর এমনভাবে করতে হবে যেন আর শোষণের উপাদান না থাকে এবং শোষণ-নিপীড়নের বীজ বিলুপ্ত হয়। একটি আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে গড়া রাজনৈতিক কৌশল, কর্মসূচি এবং সংগঠন।

সমস্ত ধরনের শোষণ-নিপীড়নের উৎস হলো এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা

আমরা এমন একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাবস্থার অধীনে বসবাস করছি যাকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা বলে। গোটা পৃথিবী এবং বাংলাদেশের জনগণের ভয়াবহ দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-যন্ত্রণার প্রকৃত উৎস ও কারণ এই ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। পৃথিবীকে পারমাণবিক ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, মার্কিন মদদপুষ্ট ইজরায়েল ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ফিলিস্তিনে গণহত্যা, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প এবং ফ্রান্সে লেপেনের মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী, যুদ্ধবাজ, পিতৃতান্ত্রিক ফ্যাসিস্টদের উত্থান এই ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপেরই ফলাফল।

বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত একটি দেশ

এই বিশ্বব্যবস্থায় দুই ধরণের দেশের অস্তিত্ব বিদ্যমান - একদিকে গুটিকয়েক সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত দেশ ও জাতিসমূহ। বাংলাদেশ এই বিশ্বব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নিপীড়িত একটি দেশ। পুঁজিবাদী- সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপের অভিঘাতই প্রধানভাবে বাংলাদেশের সমাজ-বাস্তবতার বর্তমান রূপের কারণ। প্রধানভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এবং এর সাথে বিজড়িত বাংলাদেশের দালাল শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে সুসংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিনিধি আওয়ামীলীগ সরকার এদেশের জনগণের সমস্ত ধরণের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে যেকোন ধরণের বিরোধিতাকে নির্মমভাবে দমন

করছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে আড়াল করে ও দাবিয়ে রেখে ইতিহাসের আওয়ামীকরণ করেছে। কথায় কথায় **১৯৭১** সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের একচ্ছত্র মালিকানা জাহির করছে। এ দেশের জনগণ একাত্তর সালে সাম্য, সামাজিক সুবিচার ও মানবিক মর্যাদার জন্য আত্মত্যাগ করলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাম্যের পরিবর্তে বৈষম্য, সামাজিক সুবিচারের পরিবর্তে বিচারহীনতা, এবং মানবিক মর্যাদার পরিবর্তে অবমাননা ও অবজ্ঞা।

কারণ আওয়ামী লীগ তার শ্রেণিস্বার্থ এবং সামগ্রিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাজ করেছে। সেই পাকিস্তান আমলেই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে সেন্টো এবং সিয়াটো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ফলে বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থতা থেকে মুক্ত করা দূরের কথা, বরং সময়ে সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ও দেশীয় মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বারা জনগণের উপর শোষণের মাত্রা তীব্রতর করেছে। জনগণকে বিশ্বের অন্যতম সস্তা শ্রমের নারকীয় কারখানায় (যেমনঃ গার্মেন্টস) ঠেলে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট দানবেরা লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীকে তাদের মানবখেকো মুনাফা তৈরির যন্ত্রের চাকায় পিষে দিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ কুক্ষিগত করছে। সাম্রাজ্যবাদী পরজীবীতা (parasitism) গোটা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাস শ্রমিক হিসেবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্য কারখানায় আঁটকে রাখে (যেমনঃ রানা প্লাজায় ভবন ধ্বস বা তাজরিন গার্মেন্টসের অগ্নিকাণ্ডে হাজারো শ্রমিকের মৃত্যু), এবং অলাভজনক প্রতিপন্ন হলে কর্মক্ষেত্র থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এতে করে তৈরি হয় একটি উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা যা পুনরায় সস্তা শ্রমশক্তির স্থায়ী জোগান হিসেবে কাজ করে।

১৯৪৭ সালে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিতে জন্ম নেওয়া সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর রাষ্ট্র - পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি শাসক গোষ্ঠীর সাথে বাঙালি জাতিয়তাবাদী রাজনীতির ভিত্তিতে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা করতে চাওয়া আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব **১৯৭১** সালে সম্প্রসারণবাদী ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় চেপে বসে। স্বভাবতই শ্রেণিস্বার্থের কারণে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর কোন বৈপ্লবিক রূপান্তর না ঘটিয়ে আওয়ামীলীগ এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা তীব্রতর করে। পর্যায়ক্রমে আওয়ামীলীগ এবং পরবর্তী ক্ষমতাসীন দলগুলো সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এবং এর প্রতিনিধিত্বকারী বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদি সংস্থাগুলোর পরামর্শে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এদেশের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশিলতা বজায় রাখে এবং অর্থনীতির সামন্তীয় উপাদানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিকৃত পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটায়।

লক্ষ লক্ষ প্রাণের আকাঙ্খার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে যে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা এসেছে তা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে বিচ্ছেদ এবং দেশীয় মুৎসুদ্দি শাসক শ্রেণিকে উচ্ছেদ না করে জনগণ মুক্তি অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীনে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সূচনাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই দেশে ক্রমাগত জনগণের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যকার অসমতা গভীরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে, এর মৌলিক সম্পর্ক ও গতিপ্রকৃতি অক্ষত রেখে জনগণের ভেতরকার অসমতা দূর করা সম্ভব নয়। এছাড়াও সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের পাশাপাশি জাতিগত, লিঙ্গগত, ধর্মগত, বর্ণগত পার্থক্যও বিরাজ করে। আদিবাসীদের উপর জাতিয়তাবাদী শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত জাতিগত নিপীড়ন আমাদের সমাজের একটি অন্যতম ফাঁটলরেখা (Faultline)। কারণ বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর পক্ষে আদিবাসী জনগণের উপর জাতিগত নিপীড়ন বিলোপ করা সম্ভব না। পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির কাছে ক্ষমতার ভাগ চাওয়া আওয়ামীলীগের মতাদর্শিক ভিত্তি যেহেতু ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সেহেতু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নব্য বাঙালি শাসকশ্রেণি তার জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ সকল জাতিসত্তার উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করার চেষ্টা করে, যা আদিবাসী জনগণের উপর জাতিগত নিপীড়নের অন্যতম ভিত্তি। জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দূরের বিষয়, বরং অবাঙালি জাতিসমূহকে প্রতিনিয়ত বাঙালিকরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। সেই থেকে চলছে আদিবাসী জনগণের উপর নিপীড়ন যা পরবর্তি সকল সরকার অব্যাহত রেখেছে এবং কখনও কখনও তীব্রতর করেছে। পার্বত্য চট্রগ্রামে স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে ধারাবাহিকভাবে গুম, খুন, নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, লুন্ঠন ও উচ্ছেদ চালানো হচ্ছে। আদিবাসী জনগণের যেকোনো ধরনের প্রতিরোধকে নির্মমভাবে দমন করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থাকে দাফন করা ছাড়া আদিবাসী জনগণের মুক্তির অন্য কোন পথ খোলা নেই।

সমাজের নিচুতলায় অবস্থিত প্রচণ্ড রকম শোষিত, নিপীড়িত কোটি কোটি শ্রমজীবী জনগণ যাদের দৈনন্দিন জীবন সবসময় বিভীষিকাময় এবং যাদের উপর এই রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত

অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন চালায় তাদের মুক্তির জন্য এই বৈষম্যমূলক-নিপীড়ক ব্যবস্থাকে গুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। পাশাপাশি রয়েছে সমাজে বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত মধ্যবিত্ত জনগণ যারা সর্বহারা জনগণের তুলনায় অধিক সুবিধা ভোগ করে এবং যারা তুলনামূলকভাবে এই ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার কম হয়। তারা যদি বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির বেঁধে দেওয়া সীমানা অতিক্রম করে তবে তাদের উপরেও নেমে আসে নির্যাতন। কারণ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিও শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির অধীনস্থ এবং তাদের জীবন বুর্জোয়া শাসক শ্রেণির দ্বারা নির্ধারিত। বর্তমান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার গতিপ্রকৃতির কারণে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আপেক্ষিকভাবে উন্নত জীবনের সম্ভাবনাও খর্ব হচ্ছে। বেকারত্ব, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসমতা, অবিচার, অত্যাচার পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এই বিশ্বব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদেশের অর্থনীতির সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভরশিলতা এবং এখানে স্বাধীন শিল্পের বিকাশ না ঘটার কারণে দেশের ব্যাপক জনগণের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে শাসক শ্রেণির অক্ষমতা বর্তমানে চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি। বাংলাদেশের মত সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশে এসব সমস্যার তীব্রতা যেকোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। তৃতীয় বিশ্বের এ সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদ অবাধ শোষণের জন্য গোটা সমাজকে তার বিশ্ব-অর্থনৈতিক সার্কিটে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যার ফলে সমাজের চিরাচরিত মূল্যবোধ এবং চিরাচরিত পরিবার কাঠামো ব্যাপকভাবে অবদমিত হয়েছে। একই সঙ্গে এই ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি এখানকার এবং সারা বিশ্বের বিপুল সংখ্যক নারীকে বৈশ্বিক শ্রমশক্তির বাজারে যুক্ত হবার দিকে ধাবিত করেছে। কিন্তু পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থানের এই পরিবর্তন একটি প্রতিহিংসামূলক পিতৃতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে এবং নারী-বিদ্বেষী ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির উত্থান ঘটিয়েছে। এই ধর্মীয় মৌলবাদীরা নারীদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ মনে করেনা। তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক শিকলকে ব্যবহার করে বাস্তবে বিদ্যামান সামাজিক শিকলকে শক্তিশালী করতে চায় যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সহিংসভাবে নারীদের অধীনস্থ করে রাখা।

এই একই ব্যবস্থা অবিরামভাবে পৃথিবীর পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যকে বিপর্যয়ের দিকে চালিত করছে। প্রতি বছর বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এর একটি পূর্বাভাস। খোদ জাতিসংঘের মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সংখ্যা তিন কোটিতে পৌঁছাবে। এই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে জলবায়ু সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসলামি মৌলবাদ- আমাদের দরকার একটি ভিন্ন পথ!

এদেশের শাসকশ্রেণি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখতে সবসময়ই সহিংসতা, নির্যাতন-নিপীড়ন অথবা স্বৈরাচারী শাসন বলবৎ রাখবে। পুলিশী নিপীড়ন, বাকস্বাধীনতা হরণ, কালো আইন প্রণয়ন ইত্যাদি এবং সমস্ত ধরণের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা ছাড়া এই ব্যবস্থার আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় নেই। বিএনপি, জামায়াতে ইসলাম বা অন্য যেকোন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর অধীনে এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। গণতন্ত্রের লঙ্ঘন কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা জনগণের ক্ষোভকে পুঁজি করে বিএনপি-জামায়াত কিংবা অন্যান্য পেটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক শক্তি গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগনের ন্যায্য আন্দোলনকে ব্যবহার করে এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় ক্ষমতায় আসতে চায়। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে বিএনপি-জামায়াত আওয়ামীলগের মতোই সাম্রাজ্যবাদের পা-চাটা কুকুর। বিএনপি-জামায়াত এবং বিবিধ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প সেবাদাস হিসেবে ক্ষমতায় এসে এই একই ব্যবস্থার ভেতরে জনগণকে আটকে রাখতে চায়। প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামি মৌলবাদী শক্তিগুলো সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী এই দালাল শাসকশ্রেণিকে লুটপাট, দূর্নীতি এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের অধঃপতিত-অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রতিনিধি ও প্রচারক হিসেবে চিত্রিত করে এদের বিরোধিতা করে। কিন্তু এরা কোনভাবেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন শক্তি নয়, বরং এরা সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে এই বিশ্ব ব্যবস্থার ভেতরেই ক্ষমতার ভাগ চায় এবং প্রতিহিংসার সাথে চাপিয়ে দিতে চায় অতীতের পশ্চাদপদ চিরাচরিত সম্পর্ক, রীতিনীতি, ধ্যানধারণা এবং মূল্যবোধ যা শোষণ এবং নিপীড়নের চরম রূপ হিসেবে কাজ করে। বিশেষভাবে নারীদের ক্ষেত্রে এইসব ইসলামি মৌলবাদীরা চাপিয়ে দেয় মধ্যযুগীয় বর্বরতা। ইরানে ৪৫ বছরের ধর্মতান্ত্রিক শাসন এবং আফগানিস্তানে তালেবানের ক্ষমতায় আরোহনের পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, যেখানেই ধর্মীয় মৌলবাদ ক্ষমতায় থাকবে সেখানেই পুরুষতান্ত্রিক-আধিপত্যবাদী পিতৃতন্ত্র এবং উগ্র নারীবিদ্বেষী দুঃশাসন রাজত্ব করবে। নিউ কমিউনিজমের তাত্ত্বিক স্থপতি বব এভাকিয়ান বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখা করে বলেছেন যে,

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বনাম জিহাদিদের লড়াইয়ে আমরা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল দুই পক্ষ দেখতে পাই। এক পক্ষ হলো নিপীড়িত ও উপনিবেশিত জাতিসমূহের অভ্যন্তরে

থাকা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, আরেক পক্ষ হলো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী। পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এই দুই পক্ষ একে অপরকে বলবৎ (শক্তিশালী) করে। উভয়ের মধ্যে যেকোনো গোষ্ঠীর পক্ষে যাওয়া মানে উভয়কেই শক্তিশালি করা।

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্রায়ন এবং বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিকাশের গতিবিধির অনেক বিষয় বোঝার জন্য ভীষণ জরুরী। একইসাথে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, এই দুই পক্ষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের শাসক শ্রেণি (বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ) মানবজাতির অধিক ক্ষতি করেছে এবং তারা জনগনের জন্যে সবচেয়ে বড় হুমকী।' [Bringing Forward Another Way পুস্তিকা থেকে]"

ফলে আমাদের এই দুই অচল শক্তি হতে স্বাধীন হতে হবে। কেননা এক পক্ষ নারীদের এবং সামগ্রিকভাবে জনগণকে মধ্যযুগীয় দাসত্বের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ চালাবে, অপর পক্ষ “গণতন্ত্র”, "স্বাধীনতা", "প্রগতি" ইত্যাদি উদারনৈতিক বয়ানে নারী নিপীড়ন সহ জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ অব্যাহত রাখবে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে বিচ্ছেদ এবং দেশীয় দালাল শাসক শ্রেণিকে উচ্ছেদ, এবং মানবজাতির মুক্তির উদ্দেশ্য বিপ্লবী শক্তির নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনগণের ওপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠা না করে জনগণ মুক্তি অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না।

কোন রকম সংস্কার নয়, আমাদের দরকার নিউ কমিউনিজমের ভিত্তিতে একটি প্রকৃত বিপ্লব

যারা প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির মুক্তির জন্য লড়তে চায় তাদের অবশ্যই লক্ষ্য হতে হবে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংসের মাধ্যমে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো এবং মৌলিকভাবে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জন্য সম্পূর্ন নতুন মাত্রার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। যে স্বাধীনতা জনগনকে ঐক্যবদ্ধভাবে শত-শত বছরের বিভাজন ও অসমতা যা তাদেরকে নিঃস্ব করে রেখেছে, এবং নিজেদেরকে মুক্ত করার নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ করে রেখেছে, তার মূলোৎপাটনের শক্তি যোগাবে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য আমাদের সঠিক রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক লাইন, এবং সামগ্রিক রণকৌশলগত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

বিপ্লব এবং নিউ কমিউনিজমে অন্তর্ভুক্ত হোন!

বর্তমানে নিউ কমিউনিজম ছাড়া অন্য কিছুই জনগণের সামনে বিদ্যমান বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া হাজির করতে পারবে না। যারা সত্যিকার অর্থেই বুঝতে চায় “সমস্যা কী এবং সমাধান কী”, তাদের সঠিক দিশা প্রদর্শন করতে পারবে না। কারণ নিউ কমিউনিজম হল পূর্বের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সারসংকলন এবং বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মানব প্রচেষ্টার বিবিধ ক্ষেত্রে হতে শিক্ষা গ্রহনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো যা প্রধানভাবে ইতোপূর্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাবাহিকতা এবং গৌণ-কিন্তু-গুরুত্বপূর্ণ ভুলভ্রান্তিগুলোর সাথে বিচ্ছেদ।

ফলে কেবল নিউ কমিউনিজমের তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে বর্তমানে সঠিকভাবে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা, এবং কমিউনিজমের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব। নিউ কমিউনিজম বস্তুগতভাবে কমিউনিস্ট তত্ত্ব এবং অনুশীলনের ঐতিহাসিক বিকাশে একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনাকে প্রতিনিধিত্ব করে। যদি নিউ কমিউনিজম এইদেশে এবং গোটা বিশ্বে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয় এবং আরো বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও শিকড় গাড়তে পারে তাহলে এর বিপ্লবী শক্তি গোটা পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। এটা হলো কমিউনিস্ট বিপ্লবের আগামী পর্বের তাত্ত্বিক কাঠামো যা বাস্তবতাকে সঠিকভাবে বোঝা এবং তার বিপ্লবী রুপান্তরের জন্য সবেচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব হলো জনগণের সামনে পরিষ্কারভাবে এ সত্য তুলে ধরা যে নিউ কমিউনিজমের ভিত্তিতে একটি প্রকৃত বিপ্লব ছাড়া কোনরূপ সংস্কার করে এই ব্যবস্থাকে জনগণের স্বার্থে কাজে লাগানো সম্ভব না। নিউ কমিউনিজমের তাত্ত্বিক স্থপতি আমেরিকার বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান এভাকিয়ান যেমনটা বলেছেন, “বিপ্লব ছাড়া অন্য সবকিছুই পরিশেষে অর্থহীন। এবং আমাদের সামনে দুটি পথই খোলা - হয় বিপ্লব, নাহয় সমস্ত বীভৎসতাসহ এই ব্যবস্থায় বসবাস করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই পুঁজিবাদী নরকে ঠেলে দেওয়া।” আমরা আপনাদের আহবান করছি নিউ কমিউনিজম নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, প্রচার-প্রচারণায় সামিল হতে যারা সত্যিই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন; যাদের চোখ ভিজে উঠছে লাখ লাখ শিশুর অপুষ্টিতে মৃত্যুর ঘটনায়; যারা জানেন যে এই ব্যবস্থায় "সকলের জন্য সুবিচার এবং মুক্তি" একটি ডাহা মিথ্যা; যারা ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন কোটি কোটি তরুণের জীবনীশক্তির

অপচয়ে; যারা শোষণ, নিপীড়ন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, যুদ্ধ, প্রকৃতি-ধ্বংসের বিপরীতে একটি শোষণহীন সমাজের আকাঙ্খা লালন করেন; এবং যাদের হৃদয় একটি সাম্যের পৃথিবীর জন্য লড়তে চায় যার জন্য প্রকৃত অর্থেই প্রাণ সমর্পণ করা যায়।

যোগাযোগ: newcommunismbd@gmail.com

‘নিউ কমিউনিজম’ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে-